কুরবানী ও আকীকা

মুফতী মুহাম্মদ বিলাল হুসাইন বিক্রমপুরী
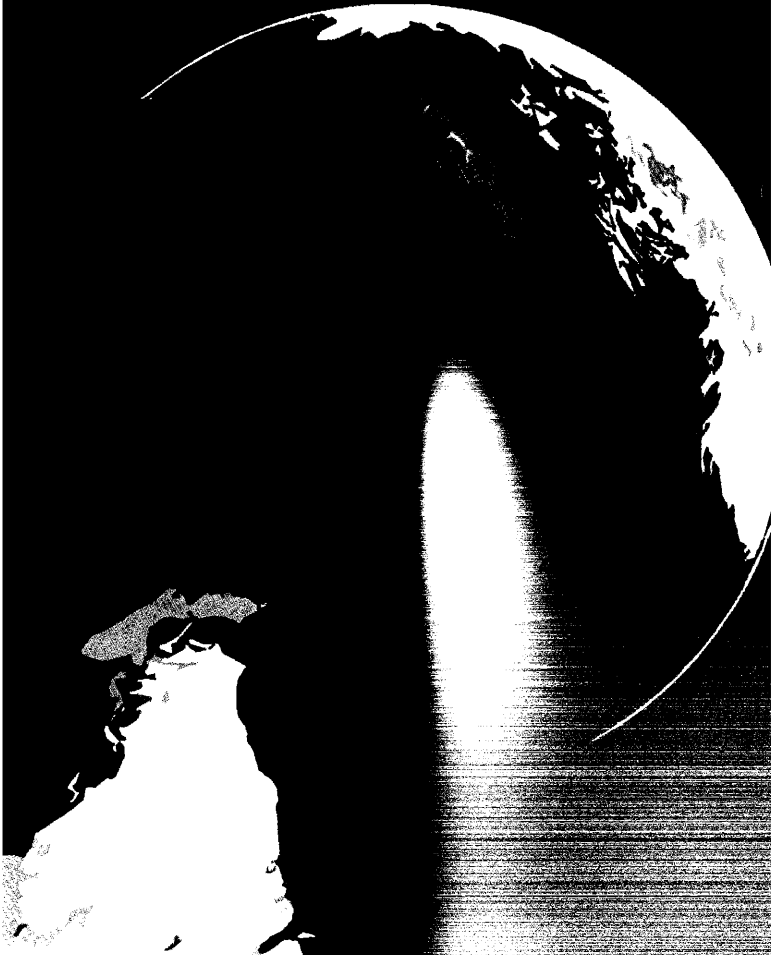
উৎসর্গ

যারা একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য কুরবানী করবে
সুন্নাতে রাসূল সা.কে ভালবেসে সন্তানের আকীকা করবে-
তাদের নামে উৎসর্গ আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সুলতানুল আউলিয়া, রঈসুল উলামা

শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী দা.বা.-এর

বাণী ও দুআ

আমার স্নেহের ছাত্র ও খলীফা মৌলভী মুফতী বিলাল হুসাইন বিভিন্ন প্রামাণ্য কিতাব থেকে বাংলাভাষাভাষী মুসলমানদের জন্য 'কুরবানী ও আকীকা' নামে সংক্ষিপ্তাকারে একখানা পুস্তিকা রচনা করেছে। এতে আমি তার উপর খুশি হয়েছি। মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দুআ করি- তিনি যেন সকল মুসলমানের উপকারী হিসেবে এই কিতাবটিকে কবুল করেন, লেখককে ইলম-আমলে ও আখলাক-চরিত্রে উন্নতি এবং দীনি কাজে বেশি বেশি খেদমত করার তাওফিক দান করেন। আমীন!
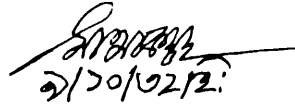
(আহমদ শফি)

খলীফা. শাইখুল ইসলাম সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.
মহাপরিচালক. দারুল উলুম হাটহাজারী চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
সভাপতি. বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক)

সিলসিলায়ে মাদানী ও সিলসিলায়ে থানভীর অপূর্ব
মিলনস্থল শাইখুল হাদীস হযরত আল্লামা
আবদুল কুদ্দুস সাহেব দা.বা.-এর

বাণী ও দুআ

আমাদের স্নেহসিক্ত মুফতী মুহাম্মদ বিলাল হুসাইন বিক্রমপুরী প্রণীত 'কুরবানী ও আকীকা' নামক কিতাবটি সংক্ষিপ্ত, অথচ সুবিন্যস্ত আকারে প্রয়োজনীয় ফাযায়েল ও মাসায়েল সমৃদ্ধ এক অতি মূল্যবান গ্রন্থ। তাছাড়া গ্রন্থখানির ভাষা প্রাঞ্জল, স্বচ্ছ ও সাবলীল। এদিক থেকে এ বইখানি সাধারণ মুসলমানদের জন্য কুরবানী ও আকীকা বিষয়ক একটি আদর্শ অনুসরণীয় গ্রন্থ হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস। আল্লাহ পাক এ কিতাবটিকে পাঠক সমাজে সমাদৃত করুন এবং উপকারী হিসেবে মনোনীত করুন। আমীন!

৭/১০/৩২/হি.
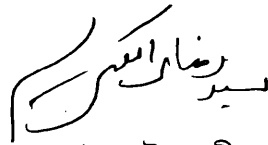
(আবদুল কুদ্দুস)

খলীফা. শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী দা. বা. এবং
মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব রহ.
মুহতামিম. জামেয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলুম ফরিদাবাদ, ঢাকা।

আমিরুল মুজাহেদীন আলহাজ হযরত মাওলানা মুফতী সৈয়দ

মুহাম্মদ রেজাউল করীম পীরসাহেব চরমোনাই-এর

বাণী ও দুআ

স্নেহাস্পদ মুফতী মুহাম্মদ বিলাল হুসাইন বিক্রমপুরী প্রণীত 'কুরবানী ও আকীকা' নামক পুস্তিকাটি একটি চমৎকার রচনা– যাতে কুরবানীপূর্ব দিবসসমূহের ফযিলত ও করণীয় আমল, কুরবানী ও আকীকার তত্ত্বকথা, ফাযায়েল ও মাসায়েলকে এমন সুবিন্যস্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে, যা সাধারণ পাঠকদের জন্য বোধগম্য ও আমল করার জন্য নিতান্তই সহায়ক। আল্লাহ্ পাক এ পুস্তকটিকে কবুল করুন এবং একে সকল মুসলমানের জন্য উপকারী সাব্যস্ত করুন। আমীন!

(রেজাউল করীম)

মুহতারাম আমীর. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
সাহেবজাদা ও খলীফা. হাদীয়ে বাঙ্গাল মাওলানা ফজলুল করীম রহ.

লেখকের কথা

'প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর উপর দীনি ইলম শিক্ষা করা ফরয'– এই হাদীসটি প্রায় প্রত্যেক মুসলমানই জানেন। আবার এও জানেন যে, আরেক হাদীসে হালাল উপার্জন অন্বেষণ করাকে ফরয বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান মুসলিম সমাজ এই দ্বিতীয় হাদীসটির উপর আমল করতে গিয়ে এতটা সীমাতিরিক্ত করে ফেলেছে যে, প্রথম হাদীসটির বাস্তবায়নের চিন্তা আর তাদের মাথায় নেই। ফলে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীস্বরূপ যা কিছু তারা করে, সেগুলোর শতকরা নব্বই ভাগই ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। অধিকন্তু যে জীবিকা তারা উপার্জন করছে, তাতেও রয়েছে সুদ, মিথ্যা ও ভেজালের সমারোহ। অথচ সাহাবায়ে কেরামের মুবারক জামাতের প্রত্যেক সদস্যই (আসহাবে সুফফার ক্ষুদ্র দলটি বাদে) জীবিকা উপার্জনের পাশাপাশি রাসূলের সোহবতে থেকে দীনি ইলমও শিক্ষা করেছেন এবং সে অনুপাতে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী নির্ভুলরূপে করে গেছেন।

শত ব্যস্ততার মাঝেও মুসলিম সমাজ যেন দীনি ইলম শিখতে পারে– সেজন্যে আমাদের এবারের আয়োজন 'কুরবানী ও আকীকা' নামক ক্ষুদ্র বইটি। গ্রন্থটির পরিসর ছোট হলেও কুরবানী ও আকীকা বিষয়ক প্রায় সকল প্রয়োজনীয় জানার বিষয় এতে স্থান পেয়েছে। এর সাথে জিলহজ মাসের ফযিলত ও করণীয়, কুরবানীর দিনে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক দুটি প্রয়োজনীয় আলোচনা সংযোজন হয়েছে। মজার ব্যাপার হল, এ সম্পূর্ণ বইটি এক বৈঠকেই পড়ে নেয়া যায়। আল্লাহ পাক আমাদের এ দীনি প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং একে বাংলাভাষী মুসলমান ভাই-বোনদের জন্য কল্যাণকর ও উপকারী সাব্যস্থ করুন। আমীন!

মুহা. বিলাল হুসাইন বিক্রমপুরী
পূর্ব-শিংপাড়া, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।

সূচিপত্র

অবতরণিকা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনাতে আগমন করলেন তখন মদীনাবাসীদের দুটো দিবস ছিল- যে দিবসে তারা খেলাধুলা করতো। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন- এ দু'দিনের কী তাৎপর্য রয়েছে? মদীনাবাসী উত্তর দিলেন- আমরা মূর্খতার যুগে এ দু'দিনে খেলাধুলা করতাম। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ দু'দিনের পরিবর্তে তোমাদের জন্য এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দুটো দিন দিয়েছেন- তা হল ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর। [আবু দাউদ]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী রহ. লিখেন- ঈদুল আযহা বা কুরবানীর ঈদ হল ঈদুল ফিতরের চেয়েও মর্যাদা সম্পন্ন। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- এ দিনটি হল বছরের শ্রেষ্ঠ দিন। এ দিনে ঈদের নামায ও কুরবানী একত্র হয়, যা ঈদুল ফিতরের নামায ও সদকায়ে ফিতরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলকে 'কাওসার' দান করেছেন। এর শুকরিয়া স্বরূপ তিনি তাকে এ দিনে কুরবানী ও নামায আদায়ের নির্দেশ দেন। [লাতায়েফুল মাআরিফ]

জিলহজ মাসের ফযিলত

জিলহজ মাসের ফযিলত বর্ণনায় এতটুকুই যথেষ্ট যে, ইসলাম ধর্মের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হজের মত একটি পবিত্র ইবাদত এই মাসের মধ্যেই আদায় করার বিধান রয়েছে বিধায় 'জিলহজ' বলে এই মাসের নামকরণ করা হয়েছে। হজের সাথে সাথে কুরবানীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটিও এই মাসের ১০ তারিখে সম্পাদন করা হয়। তাছাড়া এই জিলহজ মাসের নবম তারিখ বাদ আসর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সর্বাধিক সাফল্যমণ্ডিত আয়াতখানা নাযিল হয়, যাতে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ কল্যাণের উৎস ও মনোনীত ধর্ম বলে ঘোষিত হয়েছে।

জিলহজ মাসের প্রথম দশকের ফযিলত

হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর জন্য জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের চাইতে এত উত্তম আর কোন দিন নেই। [তিরমিযী]

উক্ত হাদীসের আলোকে হাদীসশাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ বলেন, বছরের সমস্ত কাল ও সময়ের তুলনায় জিলহজ মাসের প্রথম দশক অধিক ফযিলতপূর্ণ। এমনকি সামগ্রিক বিচারে জিলহজ মাসের প্রথম দশকের দিনগুলো রমজানের শেষ দশকের দিবসসমূহের চেয়ে অধিকতর মর্যাদার অধিকারী। কারণ, এ দিনগুলোতে তালবিয়াহ-এর দিন, আরাফার দিন ও কুরবানীর দিন রয়েছে। তবে রমজানের শেষ দশকের রাতগুলো জিলহজ মাসের প্রথম দশকের রাতসমূহের চেয়ে অধিকতর মর্যাদার অধিকারী। কারণ, তাতে শবে-কদর রয়েছে। [যাদুল মাআদ]

জিলহজ মাসের প্রথম দশকের আমলসমূহ

১. একটি বিশেষ আমল : হাদীস শরীফে আছে, যেসব লোক জিলহজ মাসের চাঁদ ওঠার পর থেকে কুরবানীর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নিজ দেহের কোন পশম বা চুল, নখ না কেটে কুরবানীর দিন পর্যন্ত জবাইয়ের পর এগুলো পরিষ্কার করে, তাহলে সে ব্যক্তি একটি পূর্ণ কুরবানী করার সওয়াব পাবে।

[আবু দাউদ] চাই সে কুরবানী করুক বা গরীব হওয়ার দরুন কুরবানী না করুক।[মুফতী জসীমুদ্দীন, কুরবানী কি]

উক্ত আমলটি করার নিয়ম হলো, জিলহজ মাস শুরু হবার আগেই চুল-নখ ইত্যাদি পরিষ্কার করে নিবে। যদি পরিষ্কার না করার দরুন চল্লিশ দিনের বেশি সময় হয়ে যায়, তাহলে গুনাহগার হবে। তাই চল্লিশ দিনের আগেই এগুলো পরিষ্কার করা জরুরি। যদিও তখন জিলহজ মাসের চাঁদ উদিত হয়ে যায়।[মাওলানা সাইফুল্লাহ, মাসায়েলে উয্‌হিয়্যাহ]

২. দিনে রোযা রাখা : হাদীস শরীফে আছে, জিলহজ মাসের প্রথম দশকের দিনগুলোর (দশম দিনে কুরবানীর দিন বাদে) প্রতি দিনের রোযা এক এক বছর রোযা রাখার সমান। [তিরমিযী] বিশেষত এই মাসের নবম তারিখ তথা আরাফার দিনের একটিমাত্র রোযা দ্বারা পেছনের এক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।[মুসলিম]

৩. রাতে ইবাদত করা : হাদীস শরীফে আছে– জিলহজ মাসের প্রতি রাতের ইবাদত শবে-কদরের ইবাদতের সমতুল্য। [তিরমিযী] আর শবে-কদরের ইবাদত এক হাজার মাস বা তিরাশি বছর চার মাস ইবাদত করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। [আল-কুরআন] বিশেষত যে ব্যক্তি ঈদুল আযহার রাতে জাগ্রত থেকে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকবে, কিয়ামতের ভয়াবহতার দরুন যখন মানুষের দিল মরে যাবে, সেদিন তার দিল মরবে না; বরং সহিষ্ণু ও ধীর-স্থির থাকবে।[তাবরানী]

৪. অধিক পরিমাণে যিকির ও দুআ করা : হাদীস শরীফে আছে– জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনে নেক আমল করার চেয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয় ও মহান কোন আমল নেই। তাই তোমরা এ সময়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার', 'আলহামদুলিল্লাহ' বেশি বেশি করে আদায় কর। [মুসনাদে আহমদ] সবচেয়ে উত্তম দুআ হলো নবম তারিখ তথা আরাফার দিনের দুআ। [তিরমিযী] আরাফার দিন আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের এত অধিক সংখ্যক জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য কোন দিনে দেন না।[মুসলিম] তাই আরাফার দিনে নিজের জন্য ও জীবিত-মৃত মুসলমানদের জন্য বেশি বেশি তাওবা-ইস্তেগফার পড়া।

৫. উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা : হাদীসে আছে– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

উমর ও হযরত আবু হুরায়রা রা. জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনে বাজারে যেতেন ও তাকবীর পাঠ করতেন। আর লোকজনও তাঁদের অনুকরণ করে তাকবীর পাঠ করতেন। [বুখারী] তাই এই দিনগুলোতে পুরুষগণ প্রকাশ্যে ও উচ্চৈঃস্বরে মসজিদ, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, বাজারসহ সর্বত্র তাকবীর বলবে। আর মহিলারা বাড়িতে নিম্নস্বরে তাকবীর বলবে। এ তাকবীর বলা সুন্নাত।

তাকবীরে তাশরীক

জিলহজের নয় তারিখের ফজর থেকে তের তারিখের আসর পর্যন্ত সর্বমোট ২৩ ওয়াক্তের ফরয নামাযের পর একবার তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব। তাকবীরে তাশরীক হলো–

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।

সে নামায জামাতের সাথে আদায় করা হোক বা একা। তবে মহিলাগণ চুপিসারে পাঠ করবে। [শামী]

তাকবীরে তাশরীক একবার বলা ওয়াজিব। তিনবার বলা সুন্নাত নয়। [রহিমিয়া]

সর্বযুগে সকল ধর্মে কুরবানী

হযরত আদম আ.-এর যুগ থেকে শুরু করে সর্বযুগেই একটি স্বতন্ত্র ইবাদত হিসেবে কুরবানীর বিধান চলে আসছে। আল্লাহ পাক বলেন–

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

কুরবানীর নিয়ম প্রতিটি উম্মতের মধ্যেই ছিল, যেন তারা তাদের পশুর মধ্যে তাদেরকে যে রিযিক দেয়া হয়েছে তাতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে। [হজ : ৩৩]

উপরিউক্ত আয়াতের দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পৃথিবীর সকল ধর্মে কুরবানী করার রেওয়াজ বিদ্যমান ছিল। এমনকি জাহেলিয়াতের যুগেও মানুষ কুরবানীকে ইবাদত হিসেবে পালন করতো। তাদের কেউ মূর্তির নামে, কেউ কোন নবীর নামে কুরবানী করতো। কিন্তু ইসলাম আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কুরবানী করাকে সম্পূর্ণ হারাম বলে আখ্যায়িত করেছে। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

নামায এবং কুরবানী করুন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। [কাওসার : ২]

ইসলামে কুরবানীর সূচনা

হযরত আদম আ.-এর যুগ থেকে সর্ব যুগেই কুরবানীর নিয়ম চলে আসছে। তবে হযরত ইবরাহীম আ. কর্তৃক আপন প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করার দৃশ্যটি আল্লাহ পাকের খুবই পছন্দ হয়। ফলে আল্লাহ পুত্রের পরিবর্তে পশু কুরবানীর ব্যবস্থা করেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা উজ্জীবিত রাখার জন্য কুরবানীকে একটি পছন্দনীয় ইবাদত হিসেবে বান্দাদের উপর আবশ্যক করে দেন। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه فى الأخرين

এবং এক মহান বস্তু (দুম্বা) তার ফিদিয়া রূপে দান করলাম আর একে পরবর্তী বংশধরের জন্য স্মরণীয় করে রাখলাম। [সাফফাত : ১০৭-১০৮]

আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেন– হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় হিজরীতে বনি কায়নুকা যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে কুরবানীর সময় এসে পড়ে। তাই তিনি ঈদগাহের দিকে গমন করেন এবং

মুসলমানদের নিয়ে ঈদুল আযহার নামায আদায় করেন। আর এটি ছিল মদনী যুগের প্রথম কুরবানীর ঈদ। অতঃপর দুটি ছাগল, অন্য বর্ণনা মতে একটি ছাগল দ্বারা কুরবানী করেন। আর এটি ছিল তাঁর প্রথম কুরবানী; যা মুসলমানগণ প্রত্যক্ষ করেন। [আত্-তারীখ ফিল কামেল]

হাদীস শরীফে এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন– কুরবানীর যথার্থতা কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তোমাদের পিতা ইবরাহীম আ.-এর সুন্নত ও স্মরণে তা করা হয়। [মুসনাদে আহমদ]

ইসলামে কুরবানীর গুরুত্ব

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন– হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ বছর মদীনায় ছিলেন এবং প্রতি বছর কুরবানী করেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যে ব্যক্তির কুরবানী করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে উপস্থিত না হয়। [তারগীব ও তারহীব]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতি বছর কুরবানী করা এবং সামর্থবান ব্যক্তির কুরবানী না করার দরুন সতর্কবাণী উচ্চারিত হওয়া কুরবানী করাটা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। [মিরকাত] তাই আমাদের হানাফী মাজহাব মোতাবেক প্রত্যেক 'সাহেবে নেসাব' বা শরীয়ত মতে সামর্থবান ব্যক্তির উপর কুরবানী করা ওয়াজিব।

কুরবানীতে উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য

কুরবানীর বিধান যদিও সকল ধর্মে বিদ্যমান ছিল কিন্তু কোন উম্মতের জন্য কুরবানীর গোশত খাওয়া হালাল ছিল না; বরং তারা কুরবানীর গোশতকে কোন ময়দানে কিংবা পাহাড়ে রেখে দিত আর আসমান থেকে আগুন এসে তা গ্রাস করে ফেলতো। এতে তাদের কুরবানী কবুল হয়েছে বলে মনে করা হতো। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের জন্য নেয়ামত স্বরূপ কুরবানীর গোশত খাওয়া হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। [মাআরেফুল কুরআন]

কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য

কুরবানী গোশত খাওয়ার জন্য নয় এবং নিজেকে ধনবান হিসেবে প্রকাশ করার জন্যও নয়; বরং কুরবানী হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পশুকে জবাই করা এবং এভাবে নিজেকে উৎসর্গ করার অনুভূতি সৃষ্টি করা। কুরআন ইরশাদ হচ্ছে–

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ

কুরবানীর গোশত, রক্ত এগুলোর কোনটিই আল্লাহর দরবারে পৌঁছে না। পৌঁছে শুধু তোমাদের তাকওয়া। [হজ : ৩৭]

إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَـٰلَمِينَ

আমার নামায আমার কুরবানী আমার জীবন আমার মরণ একমাত্র রাব্বুল আলামীনের জন্য। [আনআম : ১৬১]

কুরবানীর ফযিলত

নির্ভরযোগ্য হাদীগুলো দ্বারা কুরবানীর যেসব ফযিলত বর্ণিত হয়েছে, তা হলো–

১. কুরবানীর দিনে কুরবানী করাই সবচেয়ে বড় ইবাদত। [তিরমিযী]

২. কুরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়। [তিরমিযী]

৩. কুরবানীর রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পতিত হওয়ার সাথে সাথে কুরবানীদাতার পেছনের জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। [ইসফাহানী]

৪. কুরবানীর জন্তুর শরীরে যত পশম থাকে, প্রত্যেকটা পশমের পরিবর্তে এক একটি নেকী পাওয়া যায়। [মেশকাত]

৫. কুরবানীর পশু কিয়ামতের দিন শিং, পশম এবং চামড়াসহ প্রকাশ পাবে এবং পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য বাহন হবে। [বাদায়েউস সানায়ে]

৬. কিয়ামতের দিন কুরবানীর পশুর রক্ত ও গোশত আনা হবে এবং আমলের পাল্লায় সত্তরগুণ বৃদ্ধি করে রাখা হবে। আর এসবের বিনিময়ে সওয়াব দেয়া হবে। [ইসফাহানী]

৭. সওয়াবের আশায় কৃত কুরবানী কুরবানীদাতার জন্য দোযখের প্রতিবন্ধক হবে। [তাবরানী কাবীর]

কুরবানীর দিনে যা করণীয়

ভোরে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা এবং ফজরের নামায আদায় করা, সকালে মেসওয়াক ও গোসল করা, যথাসাধ্য উত্তম কাপড় পরিধান করা, সুগন্ধি মাখা, শরীয়তসম্মতভাবে সাজসজ্জা করা, ঈদের নামাযের আগে কিছু না খাওয়া, সকাল সকাল ইদগাহে যাওয়া, পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া, যাওয়ার পথে তাকবীরে তাশরীক জোরে জোরে পাঠ করা, এক পথে যাওয়া অন্য পথে আসা, বেশি বেশি গরীবদের দান খয়রাত করা, যথাসম্ভব ঈদগাহ্ গিয়ে ঈদের নামায পড়া, নামাযের পর খুব মনোযোগসহ দুই খুতবা শ্রবণ করা (খুতবার শব্দ কানে না পৌঁছলেও চুপ থাকা আবশ্যক), ঈদের খুশি প্রকাশ করার জন্য ঈদ মোবারক বা অন্য কোনো বাক্য বলার অবকাশ রয়েছে। [শামী, রহিমিয়া]

নিজে নিজের কুরবানীর পশু জবাই করা। অন্যথায় পুরুষ হলে সেখানে উপস্থিত থাকা। আর মহিলা হলে পর্দার সাথে সেখানে যাবার ব্যবস্থা করা। কুরবানীর গোশত আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা– এ সকল কাজের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য অর্জন ও সন্তুষ্টি অন্বেষণের চেষ্টা করা।

কুরবানীর দিনে যা বর্জনীয়

ফজরের নামায ও ঈদের নামাযসহ আবশ্যকীয় নামায না পড়া, ঈদের নামাযের পূর্বে ঘরে এবং যেখানে ঈদের নামায পড়া হবে সেখানে নামাযের

পূর্বে বা পরে অন্য কোন নফল নামায পড়া (হ্যাঁ, ঈদের নামাযের পর ঘরে নফল নামায পড়া যায়)। নামাযের পর দুই খুতবা শ্রবণ না করা। খুতবা চলাকালীন কারো সাথে কথা বলা কিংবা ইমাম-মুয়াজ্জিন মসজিদ-মাদরাসার জন্য চাঁদা তোলা। নামাযের পর রুসম হিসেবে কোলাকুলি করা। তবে ঈদের দিন অন্যান্য সময়ে কোলাকুলি করার অবকাশ রয়েছে। [আহসানুল ফতোয়া]

মাতা-পিতা ও মুরব্বীদের পা ধরে সালাম করা। পুরুষ কর্তৃক মহিলার বেশ ধারণ করা ও মহিলা কর্তৃক পুরুষের বেশ ধারণ করা। বেগানা মহিলা পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা, মহিলাদের খোলামেলা অবস্থায় রাস্তাঘাটে বের হওয়া। নাচ-গান করা। মানুষের মনের বিপরীত জোর খাটিয়ে কারো কুরবানীর চামড়া কিনে নেয়া। কুরবানীর দিবাগত রাতে মদের আসর ও যিনা অপকর্মে লিপ্ত হওয়া।

কুরবানী

শরীয়তের পরিভাষায় কুরবানী বলা হয় কোন নির্দিষ্ট পশুকে নির্দিষ্ট বয়সে নির্দিষ্ট দিনসমূহের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য জবাই করা। [আলমগিরী]

কুরবানীর প্রকারভেদ ও প্রয়োজনীয় মাসআলাসমূহ

কুরবানী প্রথমত দু'ধরনের। ওয়াজিব ও মুস্তাহাব। অতঃপর ওয়াজিব চার ধরনের।

এক. মান্নতের কুরবানী। অর্থাৎ কেউ কুরবানীর মান্নত করলে সে ধনী হোক বা গরীব, তার পক্ষে কুরবানী দেয়া ওয়াজিব।

দুই. অসিয়তকৃত কুরবানী। অর্থাৎ কোন মৃত ব্যক্তি অসিয়ত করে গেলে এবং সে পরিমাণ সম্পদ রেখে গেলে ওয়ারিসীনের পক্ষে সেই কুরবানী আদায় করা ওয়াজিব।

তিন. কোন গরীব লোক কুরবানীর নিয়তে জন্তু খরিদ করলে তার পক্ষে তা কুরবানী দেয়া ওয়াজিব।

চার. মুসলমান নারী বা পুরুষ প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্কের অধিকারী হয়ে নেসাবের মালিক হলে এবং মুসাফির না হলে তার পক্ষে এক অংশ কুরবানী দেয়া ওয়াজিব। ওয়াজিবের এ চার প্রকারের বাইরে হবে মুস্তাহাব কুরবানী।

মান্নত ও অসিয়তকৃত কুরবানীর গোশত গরীব-মিসকীনদের বণ্টন করে দিতে হবে। এছাড়া অপরাপর কুরবানীর গোশত নিজে ও আত্মীয়-স্বজন সবাই খেতে পারে।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান বা মস্তিষ্ক বিকৃত লোক নেসাবের মালিক হলেও নির্ভরযোগ্য ফতোয়া মতে তাদের পক্ষে কুরবানী দেয়া আবশ্যক নয়। তাদের অভিভাবকের পক্ষে তাদের মালামাল থেকে কুরবানী দেয়া জায়েয হবে না। তবে অভিভাবক নিজের অর্থ দ্বারা তাদের পক্ষ থেকে কুরবানী দিতে পারবে। পিতার পক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের কুরবানী দেয়া জরুরি নয়। সন্তান নেসাবের মালিক হলে নিজে কুরবানী করবে কিংবা পিতাকে অনুমতি দেবে। প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের অনুমতিক্রমে পিতা তার পক্ষ থেকে কুরবানী আদায় করতে পারে।

অনুরূপ স্ত্রীর পক্ষ থেকে কুরবানী দেয়া স্বামীর জন্য জরুরি নয়। তবে স্ত্রীর অনুরোধে স্বামী তার পক্ষ থেকে কুরবানী দিতে পারে।

নেসাবের মালিক হয়ে মুসাফির অবস্থায় থাকলে কুরবানী দিতে হয় না, তা হজের সফরই হোক না কেন। তবে সুযোগ ও সুবিধা থাকলে কুরবানী করা তার জন্য মুস্তাহাব। [জাওয়াহেরুল ফাতাওয়া]

কুরবানীর নেসাব

সদকায়ে ফিতরের নেসাবই কুরবানীর নেসাব। অর্থাৎ যার কাছে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা কিংবা সে মূল্যের নগদ টাকা রয়েছে অথবা সে মূল্যের প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল-আসবাব তথা ঘর-বাড়ি, গাড়ি ও অন্যান্য সরঞ্জাম রয়েছে– তার পক্ষে একাংশ কুরবানী দেয়া

ওয়াজিব। এই মালপত্র ব্যবসার হোক বা অন্য কিছু। এক বছর অতিক্রান্ত হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় কুরবানী ওয়াজিব হয়ে পড়ে। অনুরূপ, কৃষকদের পক্ষে উক্ত মূল্যের প্রয়োজনাতিরিক্ত পশু থাকলে কুরবানী করা ওয়াজিব হয়।

যে মহিলার মোহরানা অতি শীঘ্রই আদায়ের প্রতিশ্রুতি থাকে এবং যার মূল্য উক্ত নেসাবের সমপরিমাণ হয় এবং স্বামীও বিত্তবান হয়, তবে তার পক্ষেও কুরবানী ওয়াজিব। আর যদি সেই মোহর দেরিতে আদায়ের কথা থাকে, তবে ওয়াজিব নয়। [আলমগিরী]

উল্লেখ্য, যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, এমন ব্যক্তির ঋণ করে কুরবানী না করাই উচিত। তবুও যদি কেউ ঋণ করে কুরবানী করে তবে তার কুরবানী হয়ে যাবে এবং সে সওয়াবও পাবে। তবে এভাবে কুরবানী করা শরীয়ত পছন্দ করে না।

কুরবানীর জন্তু

পালিত পশু তথা গরু, মহিষ, উট এবং ছাগল-ভেড়া ও দুম্বা দ্বারা কুরবানী করা যাবে। গরু ও মহিষ দু'বছর, উট পাঁচ বছর, ছাগল এক বছর। কিন্তু দুম্বা স্বাস্থ্যে এক বছরের মত দেখালে এর দ্বারা কুরবানী করা যাবে।

যে জন্তুর শিং জন্মগত নেই কিংবা আছে কিন্তু ভাঙ্গা- এর দ্বারা কুরবানী জায়েয। কিন্তু যে জন্তুর শিং সমূলে উঠে গেছে সে জন্তু দ্বারা কুরবানী জায়েয নয়। অনুরূপ জবাই করার স্থানে পৌঁছতে অক্ষম এমন দুর্বল বা পীড়িত জন্তু দ্বারাও কুরবানী হয় না। অর্ধেক বা তার বেশি কান বা লেজ কাটা জন্তু দ্বারাও কুরবানী হয় না।

অনুরূপ যে জন্তুর দাঁত মোটেই নেই কিংবা অর্ধেকের বেশি নেই, এমন জন্তু দ্বারাও কুরবানী হয় না। জন্তু খরিদ করার পর কুরবানী না হওয়ার মত কোন দোষ দেখা দিলে ধনী লোক তার পরিবর্তে অন্য জন্তু জবাই করবে। কিন্তু নেসাবের মালিক নয় এমন ব্যক্তি সেটি জবাই করলেও চলবে। [দুররে মুখতার]

কুরবানীর জন্তুর দুগ্ধ বা কেশ দ্বারা উপকার লাভ করা জায়েয নয়। কেউ করলে সেই পরিমাণ অর্থ সদকা করতে হবে।

যে জন্তুর স্তনের প্রথমাংশ কাটা হয় বা রোগের দরুন দুধ শুকিয়ে যায়, তার কুরবানী জায়েয নয়। তদ্রূপ ছাগলের স্তনের দুটি থেকে একটি যদি কাটা যায় বা গরু-মহিষের চারটি থেকে দুটি কাটা যায়, তার কুরবানীও জায়েয নয়। [শামী]

শরিকানা কুরবানী

বকরি, খাসি, পাঁঠা, ভেড়া-ভেড়ী ও দুম্বায় একজনের বেশি শরীক হয়ে কুরবানী করা যায় না। এগুলো একটা একজনের নামেই কুরবানী হতে পারে।

একটা গরু-মহিষ ও উটে সর্বোচ্চ সাতজন হতে পারে। সাতজন হওয়া জরুরি নয়; দুইজন বা তিনজন বা চারজন বা পাঁচজন বা সাতজন কুরবানী দিতে পারে। তবে কারও অংশই সাত ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম হতে পারবে না। যারা নিজেরা কুরবানী দেয়, তারা যদি সম্মিলিতভাবে ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা নিজেদের মাতা-পিতা বা অন্য কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী দিতে চায়, তবে তা জায়েয হবে।

কোন অংশীদারের সওয়াবের নিয়ত না থাকলে সকলের কুরবানী বৃথা যাবে। যেমন- কুরবানীর কোন অংশীদারের নিয়ত যদি শুধু গোশত ভক্ষণ হয় অর্থাৎ মনে করে যে, কুরবানী না করলে সন্তান-সন্ততি ও অতিথিদের তুষ্ট করা যাবে না, তবে সকল অংশীদারের কুরবানী বৃথা যাবে।

বিভিন্ন অংশীদারের বিভিন্ন নিয়ত থাকলে অর্থাৎ কেউ নফল কুরবানী, কেউ ওয়াজিব কুরবানী আর কেউ আকীকার নিয়ত করলে সকলের কুরবানী শুদ্ধ হবে। অনুরূপভাবে মাসনুন ওলীমার নিয়তে কেউ পশুর মধ্যে শরীক হলে কারো কুরবানী নষ্ট হয় না। [জাওয়াহেরুল ফাতাওয়া, মাহমুদিয়া]

যার সমস্ত উপার্জন বা অধিকাংশ উপার্জন হারাম, তাকে শরীক করে কুরবানী করলে অন্যান্য সকল শরীকের কুরবানী অশুদ্ধ হয়ে যাবে। আর

যার কিছু উপার্জন হারাম, তাকে কুরবানীর জন্তুতে শরীক করাও অনুচিত। [আহ্‌সানুল ফাতাওয়া, কিফায়াতুল মুফতী]

অংশীদারের কেউ জন্তু জবেহ্ করার অনুমতি না দিলে কিংবা অনুমতি দানের ক্ষমতা কাউকে না দিলে এমতাবস্থায় তার বিনানুমতিতে অন্য অংশীদারেরা জবেহ্ করলে কারো কুরবানী হবে না। [জাওয়াহেরুল ফাতাওয়া]

অনেকেই কুরবানীর গোশত আন্দাজের উপর বণ্টন করে থাকে। এরূপ ভাগ-বণ্টন করা ভুল এবং নাজায়েয। আর যদি অন্যান্য অংশীদারেরা সম্মত থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। [আগলাতুল আওয়াম]

কুরবানীর জন্তু মারা গেলে, চুরি হলে কিংবা হারিয়ে গেলে

কুরবানীর জন্য ক্রয়কৃত কোন পশু যদি মারা যায় কিংবা চুরি বা হারিয়ে যায় এবং ক্রয়কারী এমন গরীব ব্যক্তি হয় যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, তবে তার জন্য আরেকটি পশু ক্রয় করে কুরবানী দেয়া ওয়াজিব নয়। আর ঐ ব্যক্তি ধনী হলে তাকে আরেকটি পশু কিনে কুরবানী করা ওয়াজিব হবে।

কুরবানীর জন্তু হারিয়ে যাওয়ার পর কিংবা চুরি হয়ে যাওয়ার পর অন্য জন্তু খরিদ করলে এবং পরে সেই জন্তু পাওয়া গেলে ধনী লোকের পক্ষে যে কোনো একটি জবেহ্ করা ওয়াজিব, তবে দুটিই জবেহ্ করা উত্তম। আর গরীব লোকের পক্ষে উভয় কুরবানী করা ওয়াজিব।

কুরবানীর সময়

জিলহজ মাসের দশ তারিখ সকাল থেকে বার তারিখের সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কুরবানী করা যায়। তবে দশম তারিখ হল উত্তম দিন। শেষ দিনের সূর্যাস্তের একটু আগেও যদি কেউ সফর থেকে ঘরে ফিরে কিংবা গরীব লোক নেসাবের মালিক হয়ে যায়, তবে তাদের পক্ষে কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে পড়বে।

যে সকল গ্রাম বা শহরে জুমা ও ঈদের নামাযের প্রচলন রয়েছে সেখানে দশম তারিখে ঈদের নামাযের আগে কুরবানী জায়েয নয়। কেউ নামাযের

আকীকা

আকীকার অর্থ মাথার চুল বিচ্ছিন্ন করা, চুল কাটা, চুল কেটে পরিষ্কার করা। পরিভাষায় ঐ চুলকে আকীকা বলা হয় যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় নবজাতকের মাথায় থাকে এবং সপ্তম দিন তা কেটে বিচ্ছিন্ন করা হয়। নবজাতকের এ চুল কাটাই পশু জবাই করার কারণ হয়। এ সংশ্লিষ্টতার কারণে জবাই কর্মটিকেই আকীকা নামকরণ করা হয়েছে।

আকীকার ফযিলত

হযরত সালমান ইবনে আমের রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– প্রত্যেক সন্তানের জন্মলগ্নে আকীকা করা সুন্নত। সুতরাং তাদের পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর অর্থাৎ জন্তু জবাই কর এবং তাদের হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর কর। অর্থাৎ সন্তানের মাথার চুল মুণ্ডন কর। [বুখারী]

হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– প্রত্যেক ভূমিষ্ঠ সন্তান নিজ আকীকার সাথে বন্ধককৃত। সুতরাং সন্তানের পক্ষ হতে জন্মের সপ্তম দিবসে জন্তু জবাই করবে, সন্তানের মাথা মুণ্ডন করবে এবং নাম রাখবে। [নাসাঈ]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি ভেড়া দ্বারা হযরত হাসান ও হুসাইন রা.-এর পক্ষ হতে আকীকা করেছেন। [প্রাগুক্ত]

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত প্রাপ্তির পর স্বীয় আকীকা আদায় করেছেন। [কানযুল উম্মাল]

আকীকার মাসআলা

উল্লিখিত হাদীসসমূহের আলোকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আকীকা করা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নত ও মুস্তাহাব। ছেলে অথবা মেয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সপ্তম দিবসে তার নাম রাখা এবং আকীকা করা মুস্তাহাব। যদি কেউ সপ্তম দিবসে আকীকা করতে অপারগ হয়, তবে ১৪ অথবা ২১তম দিবসে বা এরূপ সাতদিন অন্তর যে কোন দিন আকীকা করা উত্তম। অর্থাৎ সপ্তম দিবসে না করতে পারলে যখনই করুক না কেন যে বারে সন্তান জন্ম নিয়েছে তার আগের দিন করবে। যেমন- শনিবার সন্তান হয়ে থাকলে শুক্রবার আকীকা করবে। তাহলে এক রকম সপ্তম দিবসে আকীকা করা হবে; এটাই উত্তম। এছাড়াও যে কোন দিন ইচ্ছা করা যায়। তবে ৭, ১৪ অথবা ২১তম দিবসে আকীকা করলে সুন্নতের হুবহু অনুসরণের দরুন সওয়াব বেশি পাবে। এরপর করলে সওয়াব কম পাবে।

সন্তান বালেগ হওয়ার পরও তার আকীকা করা দুরস্ত আছে। তবে মৃত্যুর পর আকীকা নেই। হ্যাঁ, কেউ যদি মৃত সন্তানের আকীকা করা সুন্নত না মনে করে শুধু শাফায়াত এবং মাগফিরাতের আশায় করে তবে তা করা যেতে পারে। [ফয়জুল বারী, রহিমিয়া]

পিতা-মাতার মধ্য থেকে যার উপর সন্তানের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব, তার উপর দায়িত্ব সন্তানের আকীকা করার। মাতা-পিতার কারো যদি সন্তানের আকীকা করার সামর্থ্য না থাকে তবে ঋণ করে আকীকা করার প্রয়োজন নেই; বরং এমনটি না করাই উচিত। তবে সন্তানের পক্ষ থেকে পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কেউ যদি আকীকা করে দেয় এবং পিতা-মাতা এতে রাজি থাকে, তবে এ আকীকাই যথেষ্ট হবে। পিতা-মাতার পক্ষ থেকে পুনরায় আর আকীকা করতে হবে না। [রহিমিয়া]

আকীকার উত্তম নিয়ম হলো, ভূমিষ্ঠ সন্তান ছেলে হলে তার আকীকা দুটি ছাগল অথবা দুটি ভেড়া আর মেয়ে হলে একটি ছাগল বা একটি ভেড়া জবাই করা। অথবা যদি কুরবানীর মধ্যে আকীকা করার ইচ্ছা হয় ছেলের আকীকায় ঐ জন্তুর দুই অংশ এবং মেয়ের আকীকায় এক অংশ দিবে। কেউ অপারগ হলে ছেলের পক্ষ হতে একটি ছাগল বা একটি ভেড়া অথবা গরুর এক অংশ দ্বারা আকীকা করা জায়েয আছে। [বেহেশতি জেওর]

ছেলের জন্য দুটি এবং মেয়ের জন্য একটি আকীকা করার মূল কারণ হলো, যেহেতু মানুষের কাছে কন্যা সন্তানের চেয়ে ছেলে সন্তান বেশি উপকারী; এ কারণে ছেলের জন্য দুটি আকীকা করা তার মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল। [হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা]

একটি গরুর মধ্যে যেমন কুরবানীর সাত অংশ থাকে, তেমনি আকীকারও সাত অংশ হতে পারে। [কিফায়াতুল মুফতী]

যে জন্তু দ্বারা কুরবানী জায়েয, তা দ্বারা আকীকা করাও জায়েয আছে। আর যে জন্তু দ্বারা কুরবানী হয় না, তা দিয়ে আকীকাও হয় না। [প্রাগুক্ত]

আকীকার পশু জবাই করার নিয়ম কুরবানীর পশু জবাই করার মত। তবে স্মরণ থাকলে আকীকার পশু জবাই করার আগে এই দুআ পড়া ভালো–

اللهم هذه عقيقة فلان بن فلان فتقبله

প্রথম فلان শব্দের স্থলে সন্তানের নাম বলবে আর দ্বিতীয় فلان শব্দের স্থলে সন্তানের পিতার নাম বলবে। আর পিতা নিজে জবাই করলে বলবে– এটা আমার অমুক সন্তানের আকীকা। উক্ত দুআর সাথে কুরবানীর জবাইপূর্ব দুআটিও পাঠ করবে। তারপর 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে আকীকার পশু জবাই করবে। এটা উত্তম তরীকা। তবে কেউ এ তরীকা না জানলে শুধু 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করলেও চলবে।

আকীকার চামড়ার হুকুমও কুরবানীর চামড়ার মত। [এমদাদুল ফাতাওয়া]

আকীকার গোশত সন্তানের মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ও ভাই-বোন সকলে খেতে পারে। এমনকি কেউ বড় হয়ে নিজের আকীকা নিজে করলে এর গোশত সেও খেতে পারে। আকীকার গোশতের এক তৃতীয়াংশ গরীব-মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া উত্তম। অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের খাওয়াতে পারে। [কিফায়াতুল মুফতী]

আকীকার প্রচলিত ভুল

আকীকা সপ্তম দিনেই করা জরুরি নয়। আকীকা সপ্তম দিনে করা মুস্তাহাব মাত্র। পরে যে কোনো একদিন করে নিলেও আকীকা আদায় হয়ে যায়। [আগলাতুল আওয়াম]

ছেলের জন্য নর জন্তু মেয়ের জন্য মাদী জন্তু হতে হবে- এমন কোনো নিয়ম শরীয়তে নেই। [কিফায়াতুল মুফতী]

অনেক স্থানে এমনও নিয়ম পালন করা হয় যে, নাপিত শিশুর মাথায় ক্ষুর রেখে চুল মুণ্ডন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বকরির গলায় ছুরি চালাতে হয়- এটা নিছক কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। মাথা মুণ্ডন করার পর জবাই করা কিংবা জবাই করে পরে মাথা মুণ্ডানো সবই জায়েয। [বেহেশতি জেওর]

প্রসিদ্ধ আছে যে, আকীকার গোশত বাচ্চার মা-বাপ, দাদা-দাদী ও নানা-নানীর জন্য খাওয়া দুরস্ত নেই- এটা ভিত্তিহীন কথা। আকীকার গোশতের হুকুম ঠিক কুরবানীর হুকুমের মতো। [আগলাতুল আওয়াম]

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আকীকার জন্য অনুষ্ঠান করা এবং আমন্ত্রিত লোকদের থেকে উপহার গ্রহণ করা ইত্যাদি বিদআত ও কুসংস্কার। [মুফতি জসীমুদ্দীন, আকীকা কেন]

تم الكتاب وا لحمد لله بعزته وجلاله تتم الصالحات

স মা প্ত